FYUG- Political Science

Q. ভারতের গণপরিষদ গঠনগণপরিষদের উদ্দেশ্য,ও কার্যাবলি আলোচনা করো ?
অথবা
Q.ভারতের সংবিধান প্রণয়নের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা?
অথবা
Q.ভারতের গণপরিষদের ওপর একটি টীকালেখো ?

ভারতের সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনারূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস পর্যলোচনা করলে দেখা যায় ভারতীয়দের রাজনৈতিক ভাগ্য স্বয়ং ভারতীয়রা নির্ধারণ করবে ,এই দাবি বহু আগে ১৯২২ সালে গান্ধিজির স্বরাজ-এর মাধ্যমে উত্থাপিত হয়।

জাতীয় কংগ্রেসের দাবি: ভারতীয় স্ট্যাটিউটরি কমিশন (Indian Statutory Commission) এবং গোল টেবিল বৈঠক (Round Table Conference) ব্যর্থ হওয়ার পর ভারতের জনগণ কর্তৃক রচিত এক সংবিধানের দাবি জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯৩৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস এই দাবি জানায়। ১৯৩৮ সালে পণ্ডিত নেহরু এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংবিধান সভা বা গণপরিষদ কর্তৃক বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করতে হবে।

গণপরিষদ গঠন: ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার দাবি পুনরায় উত্থাপন করা হয়। এসবের ফলশ্রুতিস্বরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য ব্রিটিশ শাসকরা ১৯৪৬ সালের মে মাসে ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করে। ক্যাবিনেট মিশন অবিভক্ত ভারতের সংবিধান রচনার জন্য একটি গণপরিষদ বা সংবিধান সভা গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করে। ব্রিটিশ শাসকদের পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে অবিভক্ত ভারতের প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের ভোটে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গণপরিষদ (Constituent Assembly) গঠন করা হয়।

গণপরিষদের উদ্দেশ্য: গণপরিষদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করে নেহরু এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, গণপরিষদের প্রধান কাজ হবে একটি নতুন সংবিধানের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা।

সংবিধান রচনার পাঁচটি মৌলিক বিষয় বস্তুত পাঁচটি মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ বিষয়কে সামনে রেখে ভারতীয় গণপরিষদে সংবিধান রচনার কাজ হাতে নেওয়া হয়। এগুলি হল-

(i) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Federalism)
(ii) ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)
(iii) গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (Democratic Socialism)
(iv) সংসদীয় শাসনব্যবস্থা (Parliamen tary Government) এবং
(v) বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা বা পর্যালোচনা (Judicial Review)I

ভারতের সংবিধান প্রণয়নে গণপরিষদের ভূমিকা/ ভারতের গণপরিষদের কার্যাবলি:-

প্রথম অধিবেশন: ১৯৪৬ সালের ৯ থেকে ২৩ ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। মুসলিম লিগের সদস্যরা এই অধিবেশনে যোগ দেননি। এই অধিবেশনে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ গণপরিষদের প্রথম স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। এই অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু ভারতবর্ষকে স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন: গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন ১৯৪৭ সালের ২১ জানুয়ারি শুরু হয় এবং ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। এই অধিবেশনে গণপরিষদের সহসভাপতি হিসেবে হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কে নির্বাচন করা হয়।

তৃতীয় অধিবেশন: গণপরিষদের তৃতীয় অধিবেশন ১৯৪৭ সালের ২২ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে যে কটি কমিটি গঠিত হয়, তার মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি হল—
(i) কেন্দ্রীয় সংবিধান সম্পর্কিত কমিটি এবং
(ii) প্রাদেশিক সংবিধান সম্পর্কিত কমিটি।

চতুর্থ অধিবেশন: ১৯৪৭ সালের ১৪ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত গণপরিষদের চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে নতুন ভারতের জাতীয় পতাকা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি অস্থায়ী কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়।

ইতিমধ্যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় পদে যোগ দেওয়ার পর ভারত বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পূর্ণ হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে গণপরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন বসে।

পঞ্চম অধিবেশন: পঞ্চম অধিবেশনের সময় থেকে ভারতীয় গণপরিষদ স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদের মর্যাদা অর্জন করে। পঞ্চম অধিবেশন থেকে গণপরিষদ সংবিধান রচনা ছাড়াও দেশের আইনসভা হিসেবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পঞ্চম অধিবেশন ১৯৪৭ সালের ১৪ থেকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই

PEARL COACHING CENTER

অধিবেশনের শুরুতে মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসেবে গণপরিষদের প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন জি ভি মভলঙ্কর। একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্য এই অধিবেশনে খসড়া কমিটি গঠন করা হয়। ড. বি আর আম্বেদকর এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন আল্লাদি কৃষ্ণস্বমী আয়ার, এন গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, কে এম মুন্সি, সৈয়দ মহম্মদ শাহেদুল্লাহ, বি এল মিত্র, এবং ডি পি খৈতান। পরে ডি পি খৈতান ও বি এল মিত্র-র জায়গায় টি টি কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও এন মাধবরাও নির্বাচিত হন।

খসড়া কমিটি: খসড়া কমিটি ১৯৪৭ সালের ৪ নভেম্বর খসড়া সংবিধান রচনার কাজ আরম্ভ করে। পরিশেষে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি গণপরিষদের সর্বশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের সংবিধান কার্যকরী হয়।

মূল্যায়ন: ভারতের সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন করতে গিয়ে সমালোচকরা গণপরিষদের গণচরিত্রের ঘাটতির কথা তুলে ধরেছেন। তাদের মতে, যেহেতু প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদ নির্বাচিত হয়নি, তাই এতে জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। গণপরিষদে উচ্চবিত্ত এবং সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব বেশি থাকায় সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা কোনোমর্যাদা পায়নি বলে অনেকে মনে করেন। এ ছাড়া সংবিধানটিকে গণভোটে যাচাই করার জন্য কোনোগণভোটের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে একে সমালোচকরা জনগণের সংবিধান আখ্যা দিতে চাননি। গণপরিষদে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বাস্তবে গণপরিষদকে কংগ্রেস পরিষদে রূপান্তরিত করেছিল বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, সমকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে উপরি-উক্ত সমালোচনা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে মাত্র তিন বছরের মধ্যে বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান প্রণয়ন করে, সারা দেশকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক সংসদীয় শাসনব্যবস্থার স্থায়ী রাজনৈতিক কাঠামো উপহার দিয়ে, সংবিধান প্রণেতারা এক অমূল্য অবদান রেখে গেছেন।

Q.ভারতের সংবিধান রচনায় গণপরিষদের ভূমিকার সীমাবদ্ধতা আলোচনা করো ?

অথবা

Q. .ভারতের সংবিধান রচনায় গণপরিষদের সমালোচনা আলোচনা করো ?

ভারতীয় সংবিধান রচনার জন্য গঠিত গণপরিষদের গঠনব্যবস্থা ও কার্যাবলি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচিত হয়েছে। যেমন—

[1] **গণচরিত্রের ঘাটতি:** গণপরিষদের সব থেকে বড়ো দুটি ছিল এর গণচরিত্রের ঘাটতি। দামোদরস্বরূপ শেঠের মতে, যেহেতু প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদ নির্বাচিত হয়নি, তাই এতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। এই কারণে তিনি প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত নতুন একটি গণপরিষদ গঠনের দাবি জানান।

[2] **উচ্চবিত্ত প্রতিনিধির সংখ্যাধিক্য:** অনেকে মনে করেন, গণপরিষদে সমাজের উচ্চবিত্ত ও সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব সব থেকে বেশি ছিল। এর ফলে সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা বা আশা-আকাঙ্ক্ষা এখানে কোনো মর্যাদা পায়নি।

[3] **গণভোটের অনুপস্থিতি:** গণপরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধানটিকে যাচাই করার জন্য কোনোগণভোটের ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অনেকে একে জনগণের সংবিধান বলতে চান না।

[4] **পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা:** অধ্যাপক জোহারির অভিমত হল, গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া আলোচনার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা ছিল এর অন্যতম ত্রুটি। সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল করার পর্যাপ্ত ক্ষমতা সভাপতির থাকায় সাধারণ সদস্যদের মতামত এক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়নি। সংবিধান রচনায় আইনবিদদের পূর্ণ কর্তৃত্ব গণপরিষদে এক ধরনের স্বৈরাচার সৃষ্টি করেছিল বলে অনেকে মনে করেন।

[5] **কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব:** অনেকে সমালোচনা করেন যে, গণপরিষদে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বাস্তবে গণপরিষদকে কংগ্রেস পরিষদে রূপান্তরিত করেছিল।

উপসংহার: তৎকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে উপরি-উক্ত সমালোচনা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। সেই সময়ে দ্রুত এবং স্থায়ী একটি রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করাই ছিল গণপরিষদের প্রধান কাজ। তৎকালীন ভারতের অবিসংবাদী জননেতাদের নিয়ে গঠিত গণপরিষদে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য যে ছিল, একথা সত্যি। কিন্তু এর ফলে একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিগুলি সংবিধান রচনায় বাধা দিতে পারেনি, অন্যদিকে তেমনি মাত্র তিন বছর সময়কালের মধ্যে বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান রচনার পথ সুগম হয়েছিল।

Q. নেহরু রিপোর্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? কেন মুসলিম লীগ এই রিপোর্ট গ্রহণে অস্বীকার করে?

Qঅথবা

.শাসনতান্ত্রিক নীতি হিসেবে নেহরু রিপোর্ট এবং জিন্নাহর চৌদ্দ দফার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

অথবা

Q. নেহরু কমিটি কেন গঠন করা হয়? এর প্রধান সুপারিশগুলো কি ছিল?

বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির উদ্দেশ্যে সুপারিশ করার জন্যে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সাইমন কমিশন গঠিত হয়। এর সদস্যদের সবাই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় দলমত নির্বিশেষে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ শুরু থেকেই এর বিরোধিতা করেন।

একই সঙ্গে এই কমিশনের গঠন ও পরিকল্পিত কর্মসূচি ভারতীয় নেতৃত্বের প্রতি ছিল একটি চ্যালেঞ্জ, যার মূলকথা ছিল ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে নিজেদের ভেতর একটা মতৈক্য। কাজেই সাইমন কমিশন গঠনের পর নেতৃবৃন্দ একটা ডোমিনিয়ন সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন লিবারেল নেতা তেজবাহাদুর সাপ্রু, মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং কংগ্রেস নেতা মতিলাল নেহরু।
শেষোক্ত জনকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করে যে কমিটি গঠিত হয় তার পেশকৃত সুপারিশমালা নেহরু রিপোর্ট নামে খ্যাত। নেহেরু রিপোর্ট শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত হয়নি। লীগের পক্ষ থেকে বিকল্প শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা পেশ করা হয় যা জিন্নাহ্র চৌদ্দ দফা নামে পরিচিত। উভয় পরিকল্পনা দলীয় চিন্তার উর্ধ্বে ওঠে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা নির্মাণে ব্যর্থ হয়।

কাজেই নেহরু রিপোর্ট এবং জিন্নাহ্ চৌদ্দ দফা সাম্প্রদায়িক সমস্যার অচলায়তন ভাঙ্গার ব্যাপারে নেতৃবৃন্দের অক্ষমতার নিদর্শন। ১৯২৭ খ্রি. শেষ দিকে সাইমন কমিশন গঠিত হওয়ার প্রাক্কালে ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল ছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগসহ প্রায় সকল প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল উক্ত কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়।
শুধুমাত্র কতক আঞ্চলিক দল (উদাহরণ স্বরূপ, মাদ্রাজের জাস্টিস পার্টি এবং পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টি) এই নীতির ব্যতিক্রম ছিল। ইতোমধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কিছু অবদান রাখেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে দিল্লির সর্বদলীয় সম্মেলনে তিনি অন্যান্য মুসলিম নেতাকে কংগ্রেসের সঙ্গে একটা আপোষ রফায় রাজি করাতে সক্ষম হন।
মুসলিম নেতৃবৃন্দ কিছু শর্তসাপেক্ষে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নিতে সম্মত হন। শর্তসমূহ ছিল সংখ্যালঘুদের জন্যে আসন সংরক্ষণ, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ, বাংলা ও পাঞ্জাবে জনসংখ্যার অনুপাতে সম্প্রদায়গত প্রতিনিধিত্বের হার নির্ধারণ এবং তিনটি নতুন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠন (সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ)।
ডিসেম্বর (১৯২৭ খ্রি.) মাসে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে জিন্নাহ্র উপর্যুক্ত পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কিন্তু শীঘ্রই পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্র থেকে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক চাপ কংগ্রেসকে এই আপোষ ফর্মুলা প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করে। এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। নেহরু রিপোর্টে এই ফর্মুলার সার্বিক প্রতিফলন ঘটেনি বলে জিন্নাহ এই রিপোর্ট গ্রহণে অস্বীকার করেন।

রিপোর্টের প্রধান সুপারিশসমূহ ছিল নিম্নরূপ-

(১) সর্বত্র যৌথ নির্বাচন প্রথা চালু হবে ;
(২) মুসলমানদের জন্যে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে কেন্দ্রে এবং মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশসমূহে ;
(৩) সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে পৃথক করে একটি প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া হবে; কিন্তু তা করা হবে ভারত ডোমিনিয়নের মর্যাদা লাভ করার পর। সেখানকার হিন্দু সংখ্যালঘুদের জন্যে অনুপাতের অতিরিক্ত গুরুত্বের (weightage) ব্যবস্থা করা হবে ;
(৪) রাজনৈতিক কাঠামো হবে মূলত এক-কেন্দ্রিক এবং কেন্দ্রের হাতে থাকবে অতিরিক্ত (residual) ক্ষমতা।

নেহরু রিপোর্ট মুসলমানদের ভীতি দূর করে তাদের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। স্পষ্টতই দেখা যায় যে, এতে জিন্নাহর আপোষনীতি অগ্রাহ্য হয়েছে। রিপোর্টের যে অংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট সবচেয়ে বেশি আপত্তিকর মনে হয়েছে তা ছিল অবশিষ্ট (residual) ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে রাখার সুপারিশ, কার্যত এর ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অস্বীকার করা হয়।
ফলে জিন্নাহ কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে যুক্ত নির্বাচন প্রথা গ্রহণ তাৎপর্যহীন হয়ে যায়। নেহরু রিপোর্টের আরেক ক্ষতিকর দিক ছিল এর দ্বারা লখনৌ চুক্তি (১৯১৬ খ্রি.) সত্যিকার অর্থে বাতিল হয়ে যাওয়া। এই চুক্তি ছিল কংগ্রেস-লীগ সমঝোতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই চুক্তি অস্বীকারের জন্যে জিন্নাহ এবং আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মতো প্রভাবশালী মুসলিম নেতা এই রিপোর্টের ফলে কংগ্রেসের প্রতি সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। অতপর তাঁরা মুসলমানদের জন্যে রক্ষাকবচ (safeguards)-এর ব্যবস্থা করার জন্যে আরো জোরালো দাবি উত্থাপন করেন ।
১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর কলিকাতায় একটা সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নেহরু রিপোর্টের বিচার-বিশ্লেষণ করা।
মুসলিম লীগের তরফ থেকে জিন্নাহ বিরাজমান অচলাবস্থার একটা সৌহার্দ্যপূরণ সমাধানের চেষ্টা করেন। তিনি পূর্ববর্তী বছরের মার্চ মাসে পেশকৃত তাঁর আপোষনীতি পুনরুত্থাপন করেন। জিন্নাহ অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় বলেন, “আপনারা কি চান না যে ভারতের সাত কোটি মুসলমান আপনাদের সাথে থাকুক?” কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নেহরু রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতের ভবিষ্যত শাসনতান্ত্রিক কাঠামো তৈরির ব্যাপারে অটল থাকেন।

Q. জিন্নাহ কর্তৃক পেশকৃত আপোষ ফর্মুলাসমূহ কি?

অথবা

Q.চৌদ্দ দফার সারমর্ম আলোচনা করুন ।

জিন্নাহ একজন হতাশ মানুষ হিসেবে কলিকাতার সম্মেলন ত্যাগ করেন । বোম্বাই ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি একজন পার্সী বন্ধুকে সজল চক্ষে বলেছিলেন, “এখানেই আমাদের রাস্তা আলাদা হয়ে গেল।” [This is the parting of the ways.] নেহরু রিপোর্টের অন্যতম প্রণেতা তেজবাহাদুর সাপ্রু জিন্নাহর দাবি মেনে নেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন; কিন্তু তাঁর মত গ্রাহ্য করা হয়নি।
২৮ মার্চ (১৯২৯ খ্রি.) দিল্লিতে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে জিন্নাহ তাঁর চৌদ্দ দফা পেশ করেন। এই দফাসমূহ ছিল জিন্নাহ কর্তৃক নেহরু রিপোর্টের প্রত্যুত্তর। পরবর্তী দিনগুলোতে চৌদ্দ দফা মুসলিম রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

চৌদ্দ দফাসমূহ নিম্নে উল্লেখিত হল :-

PEARL COACHING CENTER

(১) ভবিষ্যত শাসনতান্ত্রিক কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) হবে এবং বাড়তি (residuary) ক্ষমতা প্রদেশসমূহের কাছে ন্যস্ত থাকবে;
(২) সব প্রদেশকে সমপরিমান স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে;
(৩) দেশের সমস্ত আইনসভায় এবং অন্যান্য নির্বাচিত পরিষদসমূহে সংখ্যালঘুদের পর্যাপ্ত এবং যথার্থ প্রতিনিধিত্ব থাকবে। কোন প্রদেশে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘুর সমপর্যায়ে নামানো যাবে না;
(৪) কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের কম হবে না;
(৫) বর্তমানে প্রচলিত পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু থাকবে। তবে কোন সম্প্রদায় যে কোন সময় যুক্ত নির্বাচনী প্রথা গ্রহণ করতে পারবে;
(৬) কোন সময়ে কোন এলাকাগত পুনর্বন্টন (Territorial redistribution) প্রয়োজন হলে তা কোনভাবে পাঞ্জাব, বাংলা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অবস্থান ক্ষুন্ন করতে পারবে না;
(৭) সকল সম্প্রদায়ের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে;
(৮) কোন নির্বাচিত পরিষদের যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত তিন-চতুর্থাংশ সদস্য যদি কোন বিলের বিরুদ্ধে এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করে যে, উক্ত বিল সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থহানি করে তবে ঐ বিল উক্ত পরিষদে গৃহীত হবে না। সেই ক্ষেত্রে অন্য কোন সম্ভাব্য ও বাস্তবসম্মত বিকল্পের ব্যবস্থা করতে হবে;
(৯) সিন্ধুকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে পৃথক করতে হবে;
(১০) অন্যান্য প্রদেশের মত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে সংস্কার প্রবর্তন করতে হবে;
(১১) এইমর্মে শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকতে হবে যাতে মুসলমানগণ অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকুরির পর্যাপ্ত সুযোগ লাভ করতে পারে;
(১২) শাসনতন্ত্রে পর্যাপ্ত রক্ষাকবচের (Safeguards) মাধ্যমে মুসলিম সংস্কৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা, ভাষা, ধর্ম, ব্যক্তিগত আইন এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের বন্দোবস্ত করতে হবে। রাষ্ট্র এবং অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানে উক্ত বিষয়সমূহের যথাযোগ্য অংশীদারিত্ব থাকতে হবে;
(১৩) কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান মন্ত্রি ব্যতীত কেন্দ্রে বা প্রদেশে কোন মন্ত্রিসভা গঠন করা যাবে না;
(১৪) ভারতীয় ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশসমূহের সম্মতি ব্যতীত আইনসভা কোন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন করতে পারবে না।
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পরস্পর বিরোধী অবস্থানের ফলে ভারতের শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এরপর দুই দলের মধ্যকার দূরত্ব আরো বেড়ে যায়। জিন্নাহ উত্তরোত্তর কংগ্রেসকে একটা হিন্দু সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেন। তিনি মনে করেন যে, এই সংগঠনের কাছ থেকে ভারতীয় মুসলমানগণ কোন সুবিচার আশা করতে পারে না। তিনি আরো শক্তিশালী অবস্থান থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে দর কষাকষির জন্যে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। এ জাতীয় চিন্তার মধ্যেই ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র আবাসভূমি তথা পাকিস্তান আন্দোলনের বীজ নিহিত ছিল।মুসলিম নেতৃত্ব কখনও কংগ্রেসকে ক্ষমা করেনি।

Q.ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা সম্পর্কে যা যান লেখা ?

অথবা

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা ও তার তাৎপর্য লেখা ?

অথবা

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা গুরুত্ব লেখা ?

সংবিধানের প্রস্তাবনা ভূমিকা : -

প্রত্যেক দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট একটি সংবিধান দরকার। আর এই সংবিধানের মূল বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, কার্যাবলী সেই দেশের জনগণের বোধগম্য করার জন্যই যে সংক্ষিপ্ত রূপে প্রকাশ করা হয় তাকেই সংবিধানের প্রস্তাবনা বলে। ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করে প্রস্তাবনার মাধ্যমেই সমগ্র শাসন। ব্যবস্থার পরিচালনা পদ্ধতি, গতিবিধি এবং প্রতিটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হয় ১৯৪৯ সালের ২৬ শে নভেম্বর এবং স্বীকৃতি লাভ করে ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী।

সংবিধানের প্রস্তাবনা ও তার তাৎপর্য :-

রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রকৃতি প্রস্তাবনা : - আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হিসাবে গড়ে তুলতে শক্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শপথ করছি এবং তার সকল নাগরিকদের জন্য।

রাষ্ট্র ব্যবস্থার আদর্শ প্রস্তাবনা : - সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়, বিচার, চিন্তা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনা, স্বাধীনতা, মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার সমতা সৃষ্টি এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সম্মতি সুনিশ্চিত করার জন্য যাতে সৌভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য।

PEARL COACHING CENTER

সংবিধানের উৎস ও সংবিধান গ্রহণের তারিখ :- আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ শে নভেম্বর এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি, নিজেদের অর্পণ করছি।

ভারতের প্রস্তাবনাকে বিশ্লেষণ করলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো চোখে পড়ে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এবং আবশ্যক হল ---

সংবিধানের প্রস্তাবনা সার্বভৌমত্ব বা সার্বভৌম : - প্রস্তাবনায় ভারতকে সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সার্বভৌমিকতা কথার অর্থ হল চরম এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা। ড. বি. আর. আম্বেদকর মন্তব্য করেন- সার্বভৌম শব্দটির মধ্যে স্বাধীনতা শব্দটি নিহিত আছে। সুতরাং স্বাধীনতা শব্দটি যুক্ত করে কোনো লাভ হবে না। অর্থাৎ ভারত ব্রিটিশ রাজশক্তির কর্তৃত্ব-বাণ থেকে মুক্ত এবং স্বাধীন ও নিজ স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী।

সংবিধানের প্রস্তাবনা সমাজতান্ত্রিক : - ভারতের মূল সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক শব্দটি ছিলনা। ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংশোধনের পর ভারতকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সমাজতান্ত্রিক কথাটি যে অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে তা ইন্দিরা গান্ধির একটি বিশিষ্ট মন্তব্য থেকে প্রকাশ পায় তা হল- আমাদের সমাজতন্ত্র আমাদের নিজস্ব রীতির সমাজতন্ত্র। যে সব ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজন মনে করব সেই সব ক্ষেত্রেই আমরা রাষ্ট্রীয়করণ করব। কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয়করণ করাই আমাদের রীতির সমাজতন্ত্র নয়।

সংবিধানের প্রস্তাবনা ধর্মনিরপেক্ষতা: - ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটি অন্তর্ভুক্তিকরণ হয়েছে। সংবিধান বিশারদ কাশ্যপ সংবিধানের ১৪ থেকে ১৫, ১৯, ২৫-২৮, ৪৪ প্রভৃতি ধারায় ধর্মনিরপেক্ষতার প্রাথমিক ব্যাখ্যা করেছেন। সকল ধর্মের সমমর্যাদা এবং অঙ্গীকারকে সুদৃঢ় করতে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে ঘোষিত করা হয়েছে।

সংবিধানের প্রস্তাবনা গণতান্ত্রিক :- প্রস্তাবনায় ভারতকে গণতান্ত্রিক দেশ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের ৩২৬ নং ধারায় ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও বলা হয়েছে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার অতিথিদের নির্বাচনে ধনী, দরিদ্র, অর্থ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, স্ত্রী, পুরুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকই ভারতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকারী।

সংবিধানের প্রস্তাবনা সাধারণতন্ত্র : - প্রস্তাবনায় ভারতকে সাধারণতন্ত্র রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।সাধারণতন্ত্র বলতে বোঝায় এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে দেশ শাসনের চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে জনগণের হাতে। এখানে উত্তরাধিকার সূত্রে পদ প্রাপ্ত কোনো শাসন থাকে না। রাষ্ট্রের প্রধান বা অন্যান্য শাসকবৃন্দই রাষ্ট্রের নাগরিকদের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

সংবিধানের প্রস্তাবনা উপসংহার : - ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা সম্পর্কে একথা বলা যায় যে ভারতীয় সংবিধানের মূল বিষয়বস্তু গতিবিধি, কার্য পরিধি, কার্য পদ্ধতি, গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা এমনকি ভারতীয় সংবিধানের পরিসর অর্থাৎ মীমাংসাও প্রকাশ পেয়েছে প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে। পণ্ডিত ঠাকুর দাস ভার্বক বলেছেন যে "ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা সংবিধানের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ, এটি সংবিধানের অন্তরাত্মা। এটি সংবিধানের অধিকারী এবং সংবিধানের মূল্য পরিমাপ করার মূল্যমান উপযুক্ত মানদণ্ড। এছাড়াও অধ্যাপক বার্কার তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'Principles of Social and Political Theory' গ্রন্থে বলেছেন "যখন আমি প্রস্তাবনা পাঠ করলাম, তখন আমার মনে হল যে, এতে আমার গ্রন্থের অনেক যুক্তি সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জন্য একে আমার গ্রন্থের মর্মবাণী রূপে ধরা যেতে পারে।

PEARL COACHING CENTER